চিদ্বিলাস

(দর্শন পরিচয়)

শ্রীবিনয় কুমার সান্যাল বি, এ,
প্রণীত

গুরবে ভাস্কর স্বরূপায় নমঃ

ওঁ শিবময়ং জগৎ।

চিদ্বিলাস।

(দর্শন পরিচয়)

শ্রীবিনয়কুমার সান্যাল বি, এ, প্রণীত।

কলিকাতা

২২ নং রাধানাথ মল্লিকের লেন হইতে

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র বসু মল্লিক দ্বারা

প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩১৫।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

কলেজ স্কোয়ার, জে. এন, বসু দ্বারা মুদ্রিত

ভূমিকা।

বহু দিবস হইতে মনে মনে একটি ইচ্ছা হইতেছিল যে সমস্ত দর্শনগুলির একটি সার সহজ ভাষাতে লিখিয়া রাখিয়া মাঝে মাঝে তাহা দেখিয়া ভোলামনকে একটু একটু করিয়া পথ্য দিব। কিন্তু মনের স্বভাবই এই যে একটি সংকল্প বা ভাব আর একটি সংকল্প বা ভাবকে জাগাইয়া তোলে। মনে হইয়াছিল যে কেবল আমারই সুবিধার জন্য কথা কয়েকটি লিখিয়া রাখি, কিন্তু এখন আবার মনে হইতেছে যে এমন সুধারস কেন সকলের সহিত বাঁটিয়া পান করি না! মনে হইতেছে দেশে অনেকে ত আছেন যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, অথবা যাঁহাদের সমগ্র দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিবার অবসর নাই, আজ এই আনন্দবার্ত্তা তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত করি। হয় ত অনেক দুঃখতপ্ত হৃদয় আছে, যাহাতে দর্শনাম্বুধির দুই একটি বিন্দু পড়িলে একেবারে জুড়াইয়া যাইবে, তাই এই চিদ্বিলাস গ্রন্থ সকলের নিকট উপস্থিত করা হইল।

বলা বাহুল্য ইহাতে আমার নিজের বিদ্যা বুদ্ধির কিছুই নাই। যাহা যাহা দেখা বা শুনা হইয়াছে তাহারই কিছু কিছু ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে।—দর্শনরূপ মহাজলধির মধ্যে যে কত রত্ন আছে ইহাতে তাহার কিঞ্চিৎমাত্র আভাস দেওয়া হইল।

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে কাশী নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঘুবীর ত্রিবেদী মহাশয় এই পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, এবং ইহার পাণ্ডুলিপি কাশীস্থ ছয় জন খ্যাতনামা পণ্ডিতের দ্বারা সংশোধিত ও অনুমোদিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা সাধারণের উপকারে আসিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

মঙ্গলাচরণ।

দুর্জ্ঞেয় তোমার তত্ত্ব করিতে প্রকাশ,
হে অচিন্ত্য! কত জন করেছে প্রয়াস।
সাংখ্যকার, পতঞ্জলি, লইয়া কুসুমাঞ্জলি,
হৃদয়ের ভক্তিভরে আকুল হইয়া,
দিয়াছেন তবপদে "প্রকৃতি" ভাবিয়া!

আবার ওদিকে দেখি ন্যায় বৈশেষিক,
ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে করিয়াছে ঠিক,
পরমাণুময় তুমি, হে অনন্ত বিশ্বস্বামী!
সেই পরমাণু হ'তে বিশ্বের উদ্ভব,
অনিল, জলধি, জীব চরাচর সব।

বেদবিদ্যা পরায়ণ মহর্ষি জৈমিনি,
কর্ম্মরূপে তোমাকেই জেনেছেন তিনি।
ধর্ম্মবীর রামানুজ, তোমারি চরণাম্বুজ,
করেছেন পরকাশ "বিশেষণ" বলি,
পূজেছেন ভক্তিভরে নেত্রনীরে গলি।

রুদ্রবীর্য্য অবতংস ব্রহ্মচর্য্যপর,
আর্য্যকুল-ধুরন্ধর, মহর্ষি শঙ্কর,
গম্ভীর জীমূতনাদে, পুনঃ ঘোর মায়া বাদে,
তোমারি স্বরূপতত্ত্ব করিবারে স্থির,
আসমুদ্র হিমাচল ভ্রমিয়াছে ধীর।

তুমি সেই এক(ই) ব্যক্তি পুরুষ প্রধান,
ভিন্নরূপে এরা যার করেছে সন্ধান,
বর্ণনে বিভিন্নমাত্র, এক(ই) কিন্তু মূল সূত্র,
অন্ধ যথা করীপৃষ্ঠ করি পরশন,
ভিন্ন ভিন্নরূপে তার কহে বিবরণ।

হে অনন্ত, বিশ্বনাথ, অব্যক্ত অব্যয়,
তোমার স্বরূপতত্ত্ব করিতে নির্ণয়
ভেদ এত ঋষিদের ; ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের ;
এ দুরূহ তত্ত্ব দেব ! বলিবে কেমনে !
অক্ষম মানব এই তত্ত্ব নিরূপণে।

কেহ বলে তুমি "ব্রহ্ম" কেহ বা "ঈশ্বর",
কেহ বলে "পরমাত্মা" তুমি অনশ্বর ;
কেহ তাতে বাধা দেয় ; জানেনা মানব হায় !

কত ক্ষুদ্র বুদ্ধি তার! ক্ষুদ্র জ্ঞানে কবে
অনন্তের অনুমান জগতে সম্ভবে?

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম শ্রুতির বিধানে,
নিয়োজিত সততই তোমার সন্ধানে,
আমাদের শ্রুতিমূলে সেই শ্রুতি সদা বলে
ঈশ্বরে বিশ্বাস নর! রাখহ প্রচুর,
বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বহুদূর।

ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি হৃদয়ের তলে,
অমৃতত্ব লভ জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মবলে;
বিনা জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, সাধনাতে অনুরক্তি,
পাবেনা পাবেনা কভু মুক্তির সন্ধান।
সাধক! ইহাই মাত্র মুক্তির সোপান।

চিদ্বিলাস

সাংখ্য দর্শন

মহর্ষি কপিলদেব এই দর্শনের প্রণেতা। ইনি কহেন যে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই অত্যন্ত পুরুষার্থ।

ত্রিবিধ দুঃখ যথা,—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ—শারীর ও মানস। আধিভৌতিক দুঃখ মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও স্থাবরাদি ভূত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। আধিদৈবিক দুঃখ যক্ষ রাক্ষসাদি দেবযোনির আবেশ নিবন্ধন উৎপন্ন হয়।

জগতে আসিয়াই লোক এই ত্রিবিধ দুঃখের অধীন হইয়া পড়ে। পুরুষকার অবলম্বন করিলে কখন কখন কোনও প্রকার দুঃখের ক্ষণিক অবসান হয় বটে, কিন্তু তাহাকে পুরুষার্থ বা মোক্ষ বলা যাইতে পারে না। এই দুঃখ সমূহের

চিরাবসান অর্থাৎ তাহাদিগের পুনরুৎপত্তির কারণ পর্য্যন্ত নাশ করাই পুরুষার্থ।

প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞানই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির কারণ। কিন্তু এই বিবেক-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ ও কার্য্য এবং জগৎ কি ও তাহার কারণ কি ইত্যাদি জানিতে হইবে। এই নিমিত্ত সাংখ্যকার পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অবতারণা করিয়া সমস্ত বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পরিদৃশ্যমান জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা জড় ও চৈতন্য এই দুই পদার্থ দেখিতে পাই। চৈতন্য পদার্থ পুরুষ এবং জড় পদার্থ প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়। এই দুই পদার্থই অনাদি, কিন্তু উভয়ে ভিন্নধর্ম্মী। সাংখ্যমতে পুরুষ বহু, কিন্তু কোনওপ্রকার প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব ; মহৎ হইতে অহঙ্কার ; অহঙ্কারের সাত্বিক অংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং অহঙ্কারের তামস ভাব হইতে পঞ্চ তন্মাত্রা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও

গন্ধ—এবং তাহা হইতে পঞ্চ মহাভূত যথা, ক্ষিতি, জল, তেজ বায়ু ও আকাশ—সৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের তিনটি প্রকার-ভেদ আছে, যথা, (১) প্রকৃতি, (২) প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয় ভাবাপন্ন, (৩) এবং বিকৃতি। প্রকৃতি শব্দে কারণ বুঝায়। মূলা প্রকৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের কারণ অথচ নিজে কাহারও কার্য্য নহে, অতএব ইহা কেবলই কারণ ভাবাপন্ন। কিন্তু মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অথচ অহঙ্কারের কারণ, অতএব ইহা প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয় ভাবাপন্ন। আবার যে সমস্ত তত্ত্ব হইতে অপর কোনও প্রকার তত্ত্ব উদ্ভূত হইতেছে না তাহারা কেবলই বিকৃতি ভাবাপন্ন।

কিন্তু পুরুষতত্ত্ব প্রকৃতি বা বিকৃতি ভাবাপন্ন নহে। পুরুষ কোনও কারণ হইতে উদ্ভূত হয় নাই এবং পুরুষ হইতে কোনও কিছু উদ্ভূত হয় না।

প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ আছে; কিন্তু পুরুষ নির্গুণ। প্রকৃতির রজোগুণ দ্বারা সৃষ্টি, সত্ত্বদ্বারা স্থিতি ও তমঃ দ্বারা প্রলয়

হইয়া থাকে। সৃষ্টি শব্দের অর্থ আবির্ভাব এবং প্রলয় শব্দের অর্থ তিরোভাব।

প্রকৃতির স্থূল ক্রিয়া দ্বারা যখন জগৎ স্থূল-রূপ ধারণ করে তখনই ইহার আবির্ভাব এবং যখন প্রকৃতির সূক্ষ্মক্রিয়া দ্বারা জগৎ সূক্ষ্মভাবাপন্ন হয় তখনই ইহার তিরোভাব। বস্তুতঃ ইহার একেবারেই ধ্বংস নাই।

প্রকৃতিতে সৃষ্টির প্রবৃত্তি ও ভোগের উপাদান আছে। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি ও ভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতিই ভোক্ত্রী ও কর্ত্রী; পুরুষ ভোক্তাও নহেন কর্ত্তাও নহেন। পুরুষ প্রকৃতিতে আসক্ত হইয়া কর্ম্মীরূপে প্রতীয়-মান হয়েন।

"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে।"

অহঙ্কার বিমূঢ় ভাবই দুঃখের কারণ। অতএব পুরুষ যখনবিদ্যা আশ্রয় পূর্ব্বক অহং তত্ত্বের উপরে উঠিয়া স্বরূপে অবস্থিত হয়েন তখন প্রকৃতির তিনগুণের সাম্যাবস্থা হয়।

প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞান সম্বন্ধে আরও কিছু স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইতেছে। পুরুষ

যদিও নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় এবং নির্গুণ, তথাপি অদৃষ্ট-বশতঃ অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া নিজের দুঃখের বীজ নিজে রোপন করেন। কর্ম্মফল হইতে অদৃষ্টের উৎপত্তি। দর্শনকারগণ বলেন যে কর্ম্মের প্রথম নাই কারণ সৃষ্টি অনাদি, অতএব পুরুষের অদৃষ্টও অনাদি। কিন্তু অনাদি হইলেও সাংখ্য-মতে কর্ম্মফল সান্ত। জ্ঞান কর্ম্মফলের ধ্বংস করিতে পারে। কর্ম্মফলের ধ্বংস হইলেই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ না হইবে। তাহা হইলেই মুক্তি। এক্ষণে এই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ ধ্বংসকারী জ্ঞান কি? "নিজ স্বরূপ বোধ।" প্রকৃতিই সমস্ত ভোগের আধার ও বোধক, নিজে সমস্ত ভোগ হইতে পৃথক, এইরূপ জ্ঞান দ্বারা নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে আর কর্ম্মফলে বাধ্য হইতে হয় না।

ইতি সংক্ষেপ

পাতঞ্জল দর্শন।

মহর্ষি পতঞ্জলি অন্যান্য দর্শনকারদিগের ন্যায় পদার্থ নিরূপণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইনি সমগ্র জীবের মঙ্গল হেতু অমূল্য যোগরত্ন সকলকে দান করিয়াছেন। ইহাতে তর্ক নাই, যুক্তি নাই; কেবল সাধন ও সিদ্ধির কথা। তুমি কাজে কর তাহা হইলেই বুঝিবে; হাজার কথা বা তর্ক বিতর্ক দ্বারা এই যোগ তত্ত্বের কিছুই বুঝিতে পারিবে না।

ইনি সাংখ্য দর্শনের মত অবলম্বন করিয়া যোগের উপদেশ দিয়াছেন। ইনি সাংখ্যোক্ত সমস্ত তত্ত্বের উপর একটি ঈশ্বর তত্ত্ব স্বীকার করেন। এই নিমিত্ত পাতঞ্জল দর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য দর্শন কহে।

মহর্ষি কপিলের মতে প্রকৃতিতে সৃষ্টির প্রবৃত্তি ও ভোগের উপাদান আছে; প্রকৃতি জড় ও পুরুষ চৈতন্য; এতদুভয়ের সান্নিধ্য হেতু জীব জগতের সৃষ্টি; অদৃষ্ট বশতঃই প্রকৃতি ও পুরুষের সান্নিধ্য হয়। কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলির মত এই

যে, প্রকৃতি ও অদৃষ্ট উভয়ই জড়; জড় কখনও জড়কে চালিত করিতে পারে না; অতএব অদৃষ্ট প্রকৃতিকে চালিত করিতে পারে না; যে পুরুষ অদৃষ্টের পরিচালক তিনিই ঈশ্বর।

যেমন স্ফটিক জবা পুষ্পের সান্নিধ্যহেতু রক্তাভাস ধারণ করে তদ্রূপ নিঃসঙ্গ পুরুষ অদৃষ্টবশতঃ প্রকৃতি সান্নিধ্যহেতু কর্ম্মা ও ভোক্তারূপে প্রতীয়মান হন। অদৃষ্ট শান্ত; ঈশ্বরই সেই অদৃষ্টের নাশ করেন এবং তদ্দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতি স্ব স্বরূপে বর্ত্তমান হয়। আমরা সর্ব্বদা বৃহৎ হইতে বৃহত্তর, উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর, জ্ঞানী হইতে জ্ঞানবত্তর, শক্তিমান হইতে শক্তিমত্তর ইত্যাদি দেখিতে পাই। যাঁহাতে সর্ব্বতত্ত্ব বীজ নিত্যই চরমোৎকর্ষ বা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাঁহাকেই পতঞ্জলি ঈশ্বর নামে অভিহিত করেন।

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষঃ ঈশ্বরঃ" "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্" "সঃ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" পতঞ্জলি কহেন যে প্রণব অর্থাৎ ওঁকার তাঁহার প্রকাশক।

পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তির নিরোধদ্বারা সমাধিসিদ্ধির নামই যোগ কহিয়া থাকেন। তিনি কহেন যে যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই নির্লেপ ও নিঃসঙ্গ তখন এতদুভয়ের যোগ হইতে পারে না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে যখন চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, তখন জ্ঞানের ও নিরোধ হয়, কারণ সমস্ত চিত্তবৃত্তিই জ্ঞান স্বরূপ; এবং যখন জ্ঞানের নিরোধ হয় তখন আত্মার নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয়, কারণ আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। ইহার উত্তর এই যে, চিত্ত বৃত্তির নিরোধের সহিত যে জ্ঞানের নিরোধ হয় তাহা খণ্ড জ্ঞান, প্রাকৃতিক জ্ঞান; কিন্তু আত্মার স্বরূপ যে জ্ঞান তাহা নিত্য এবং প্রকৃতি-দুষ্ট নহে; চিত্তবৃত্তির নিরোধদ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ বোধ হয়; সেই স্বরূপ জ্ঞানই আত্মা।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ স্বরূপ। ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচটি যোগের বহিরঙ্গ ও শেষ তিনটি যোগের অন্তরঙ্গ সাধন। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই

গুলিকে যম কহে। বাহ্য ও অন্তঃশৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরোপাসনা এই গুলি নিয়ম। যে ভাবে অধিকক্ষণ স্থিরভাবে সুখে বসিয়া থাকা যায় তাহার নাম আসন। এই আসন জয়ের পর শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়ের গতি সংযত হইয়া যায়, ইহাকে প্রাণায়াম কহে। ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে তখন তাহাকে প্রত্যাহার বলে। চিত্তকে কোন বিশেষস্থানে বদ্ধ করিয়া রাখার নাম ধারণা। সেই বস্তুবিষয়ক জ্ঞান নিরন্তর একভাবে প্রবাহিত হইলে তাহাকে ধ্যান কহে। ধ্যান যখন বাহ্যোপাধি পরিহার পূর্ব্বক কেবল মাত্র অর্থকেই প্রকাশ করে তখন তাহাকে সমাধি বলা যায়।

সমাধি দুই প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। একাগ্রচিত্তের যোগের নাম সম্প্রজ্ঞাত, কারণ ধ্যেয় বস্তু তৎকালে সম্যক্‌রূপে প্রজ্ঞাত হয়। নিরুদ্ধচিত্তের যোগের নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, কারণ তৎকালে ধ্যেয় বিষয়ক বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয় বলিয়া কিছুই প্রজ্ঞাত হয় না।

বাহ্য বিষয় হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া ভাবনীয় পরমার্থ বিষয়ে তাহাকে নিবেশ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টাকেই যোগাভ্যাস কহে। ভাবনীয় বস্তু দুই প্রকার, যথা ঈশ্বর ও অন্যান্য তত্ত্ব। ঈশ্বরই চৈতন্য ও অপরিণামী এবং অন্যান্য তত্ত্ব জড় ও পরিণামী। পরিণামী তত্ত্বকে অপরিণামী এবং অনাত্মাকে আত্মা মনে করাই বন্ধন। সমাধি দ্বারা যখন চিত্তের স্থৈর্য্য হয় তখনই পরিণামী ও আত্মার স্বরূপ বোধ হয়। এই স্বরূপ দৃষ্টির নাম মুক্তি বা কৈবল্য। কৈবল্যপ্রাপ্তি হইলে অদৃষ্টের নাশ হয়; অদৃষ্ট নষ্ট হইলে আর সৃষ্টিও হয় না, যেমন দগ্ধ বীজ হইতে আর বৃক্ষোৎপত্তি হয় না।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

ন্যায় দর্শন

মহর্ষি গোতমের মতে আত্যন্তিক দুঃখ ধ্বংসই মুক্তি। এই মুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ন্যায় দর্শন লিখিত হইয়াছে।

মহর্ষি গোতম ঈশ্বর স্বীকার করেন। তিনি বলেন জগতের উপাদান পরমাণু সৎ; কিন্তু তাহা জড় বলিয়া তাহার নিজের কোন স্বতন্ত্র ক্রিয়া নাই; পরমাণু জগতের উপাদান কারণ এবং ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ। ঈশ্বরেচ্ছায় পঞ্চভূতের পরমাণু মিলিত হইয়া জগৎরূপে প্রকাশিত হয়, এবং যখন ঈশ্বরেচ্ছায় এই জগৎ নিজকারণ পরমাণুতে ফিরিয়া যায় তখনই প্রলয়। এ সম্বন্ধে অতি সুন্দর উপমা আছে। কুম্ভকার মৃত্তিকা দ্বারা ঘট নির্ম্মাণ করে; কুম্ভকারের অথবা মৃত্তিকার অভাবে ঘট নির্ম্মিত হয় না; এইরূপ যখনই কোন কার্য্য দেখা যায় তখনই তাহার কোন কর্ত্তাও দেখা যায়; অর্থাৎ প্রত্যেক কার্য্যের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। গোতম বলেন যখন একটি অতি

সামান্য কার্য্যেরও কর্ত্তা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এই জগৎরূপ অতি মহৎ কার্য্যেরও একজন কর্ত্তা আছেন।

পরমাণু নিরবয়ব, অবিভাজ্য, অজ ও নিত্য। ইহার দুইটি সংযোগে দ্ব্যণুক ও তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্রসরেণু এইরূপে ক্রমে মহাবয়বী পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়। অবয়বী পদার্থ বিভাজ্য অতএব তাহার বিনাশ আছে। পরমাণু ও দ্ব্যণুক প্রত্যক্ষ হয় না, ত্রসরেণু ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়া থাকে। জগৎ যখন ক্রম বিভাগ দ্বারা পরমাণু-রূপে পরিণত হয়, তখনই তাহার বিনাশ, প্রলয় বা তিরোভাব।

মহর্ষি গোতম ষোড়শ পদার্থ স্বীকার করেন, যথা—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। ইহাদিগের মধ্যে প্রমেয় পদার্থতত্ত্বের জ্ঞানই মুখ্যভাবে মুক্তির হেতু, এবং অপরাপর তত্ত্বের জ্ঞান পরম্পরা সম্বন্ধে মুক্তির হেতু। প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থ তর্কেতেই ব্যবহৃত হয় বলিয়া সে সম্বন্ধে কোন প্রকার বিশেষ

উল্লেখ করা হইল না। কেবলমাত্র প্রমেয় পদার্থ কি তাহা বলা হইতেছে।

প্রমেয় দ্বাদশ প্রকার, যথা—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ। আত্মা দ্রষ্টা ও ভোক্তা। যাহাকে আশ্রয় করিয়া আত্মা ভোগ করেন তাহার নাম শরীর। যদ্দ্বারা আত্মা ভোগ করেন তাহার নাম ইন্দ্রিয়। ভোগ্য বস্তুর নাম অর্থ। ভোগ্য-বস্তুর উপলব্ধি বা জ্ঞানের নাম বুদ্ধি। যে বস্তুর সংযোগে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি হয় এবং যাহার বিয়োগে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি হয় না তাহার নাম মন। স্মরণ, অনুমান, সংশয় প্রভৃতি মনের অনেক ধর্ম্ম আছে। প্রবৃত্তি তিন প্রকার,—শারীরিক, বাচিক ও মানসিক। রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই তিনটির নাম দোষ; ইহাই প্রবৃত্তির হেতু। পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর নাম প্রেত্য-ভাব। প্রবৃত্তি হইতে যে সকল সুখ ও দুঃখের অনুভব হয় তাহার নাম ফল। অসৎকর্ম্মের ফলের নাম দুঃখ। সুখের অস্তিত্ব না থাকিলে দুঃখ হয় না, অতএব সুখও একপ্রকারে দুঃখ

বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। দুঃখের অত্যন্ত বিনাশের নাম অপবর্গ।

মহর্ষি গোতম জ্ঞানকে আত্মার স্বরূপ বলেন না; কারণ ইহাঁর মতে জ্ঞান ক্ষণিক; একক্ষণে ইহার উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে ইহার স্থিতি ও পরক্ষণে ইহার লয় হইয়া থাকে। একটি জ্ঞানের লয় না হইলে আর একটি জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। একই সময়ে দুই বা ততোধিক জ্ঞান একই ভাবে থাকিতে পারে না। যদিও অনেক সময় আমাদিগের মনে হয় যে এককালে আমাদিগের একাধিক জ্ঞান রহিয়াছে, কিন্তু তাহা বাস্তবিক নহে; বস্তুতঃ একাধিক জ্ঞান এত দ্রুত ভাবে মনের মধ্যে ক্রিয়া করে এবং তাহাদিগের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় এত দ্রুতভাবে সংঘটিত হয় যে তাহারা একই সময়ে রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।*
অতএব জ্ঞান আত্মা স্বরূপ নহে, পরন্তু ইহা আত্মা হইতে উদ্ভূত হয়।

* বায়স্কোপে ক্রমান্বয়ে ছবির পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু যেন একটি ছবি বলিয়া বোধ হয়।

এক্ষণে জীব কি প্রকারে অপবর্গ বা মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় তাহা বলা হইতেছে। গোতম মতে ষোড়শ পদার্থের জ্ঞানই মুক্তির কারণ। দেহাদিতে আত্মবোধই আমাদিগের সমস্ত অনর্থের কারণ। ইহা হইতে দেহাদি অনুকূল বিষয়ে রাগ ও তৎপ্রতিকুল বিষয়ে দ্বেষ হইয়া থাকে। এই রাগ দ্বেষই প্রবৃত্তির কারণ। প্রবৃত্তি ধর্ম্মাধর্ম্মের কারণ। ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ দুঃখের কারণ। জন্ম না থাকিলে ফল ভোগ হয় না, অতএব কর্ম্মফল জন্মের কারণ। মুমুক্ষুব্যক্তি এই তত্ত্বগুলি বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া জন্ম মৃত্যুর আদিকারণ দেহাত্মবোধকে একেবারে পরিত্যাগ করিবেন। তাহা হইলেই তাঁহার সমস্ত দুঃখের চিরাবসান হইবে।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

বৈশেষিক দর্শন।

বৈশেষিক দর্শনকে কখন কখন নব্য ন্যায়-দর্শন বলা হইয়া থাকে। কারণ মহর্ষি গৌতম যে সমস্ত প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন মহর্ষি কনাদও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তবে গৌতমের সহিত কণাদের কিছু পার্থক্য আছে। গৌতম ষোড়শ পদার্থবাদী কিন্তু কণাদ ষট্ পদার্থবাদী এবং কাহারও কাহারও মতে কণাদ সপ্তপদার্থবাদী। কিন্তু তাহাতে কোনও প্রকার বিশেষ পার্থক্য হয় নাই, কারণ কণাদ তাঁহার সপ্ত পদার্থের মধ্যেই গোতমের ষোড়শ পদার্থ রাখিয়াছেন।

কণাদের সপ্ত পদার্থ যথা,—দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। কেহ কেহ বলেন এই অভাব কোন পদার্থ নহে, কারণ এক স্থানে এক বস্তুর ভাবই অপর বস্তুর অভাব। আবার কেহ বলেন যে দুঃখের অত্যন্ত অভাবই যখন মুক্তি তখন অভাবও একটি পদার্থ বিশেষ। তবে এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

দ্রব্য নয়, প্রকার, যথা,—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। প্রথম চারিটি দ্রব্যের কেবলমাত্র পরমাণু নিত্য ; আকাশ সর্ব্বাবস্থাতেই নিত্য কি না সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু শেষোক্ত চারিটি দ্রব্য ভূত পদার্থ নহে, তাহারা সর্ব্বক্ষণে নিত্য। আত্মা ও মন সম্বন্ধে গোতমের ও কণাদের এক মত।

গুণ চতুর্ব্বিংশতি প্রকাশ, যথা—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। প্রত্যেক দ্রব্যেতে এই সমস্ত গুণের একটি বা অনেকগুলি বর্ত্তমান আছে।

কর্ম্ম পাঁচ প্রকার—উৎক্ষেপন, অবক্ষেপন, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন।

সামান্য শব্দে জাতি বুঝায়। জাতি নিত্য। জাতি দুই প্রকার পরা ও অপরা। সত্ত্বা অপেক্ষা অধিক দেশ ব্যাপী জাতি নাই বলিয়া ইহাকে পরা জাতি কহে। যে সমস্ত জাতি অল্পদেশব্যাপী তাহারা অপরা জাতি।

কণাদ 'বিশেষ' নামে একটি পদার্থ স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহার দর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন। এই বিশেষ পদার্থ কেবলমাত্র পরমাণু সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। সমস্ত অবয়বী পদার্থ নিজ নিজ অবয়ব ভেদে পৃথক বলিয়া বোধ হয়; যেমন ঘট ও পটের আকার ভেদ আছে বলিয়াই আমরা উহাদিগের পার্থক্য বোধ করিতে পারি। মহর্ষি কণাদ বলেন যে পরমাণুর প্রকার ভেদ আছে। কিন্তু পরমাণু নিরবয়বী বলিয়া তাহা-দিগের প্রকারভেদের কোনও প্রকার স্থূল নিদর্শন নাই। যে সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় পদার্থ পরমাণুদিগের প্রকারভেদ সংঘটন করে মহর্ষি কণাদ তাহাকেই "বিশেষ" কহেন।

অবয়বীর সহিত অবয়বের, জাতির সহিত ব্যক্তির, গুণ ও কর্ম্মের সহিত দ্রব্যের, এবং বিশেষের সহিত নিত্য পরমাণুর সম্বন্ধের নাম সমবায়।

অভাব প্রধানতঃ দুই প্রকার—সম্বন্ধের অভাব, ও ভেদ। সম্বন্ধের অভাব তিন প্রকার – এক বস্তুর সহিত আর এক বস্তুর পূর্ব্বে সম্বন্ধ ছিল

না, কিন্তু পরে হইয়াছে ইহার নাম প্রাগভাব; আবার এক বস্তুর সহিত আর এক বস্তুর সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু সেই সম্বন্ধ নষ্ট হইয়াছে, ইহার নাম ধ্বংসাভাব, আবার এক বস্তুর সহিত অন্য এক বস্তুর কখনই সম্বন্ধ ছিল না এবং হইবে না—যেমন আকাশ ও রূপ,—ইহার নাম অত্যন্ত অভাব। ঘটেতে পটের অভাব এবং পটেতে ঘটের অভাব, ইহার নাম ভেদ।

মুক্তির জন্য আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক। মনন অনুমানের দ্বারা সাধিত হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান না হইলে অনুমান হইতে পারে না। আবার পদার্থ জ্ঞান না হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মে না। অতএব পদার্থতত্ত্ব জ্ঞানই পরম্পরা সম্বন্ধে মুক্তির কারণ। আত্মা ও অনাত্মা উভয়ের জ্ঞান হইলে জীব অনাত্মপদার্থ ত্যাগ করিয়া আত্মসাক্ষাৎ বা মুক্তিলাভ করেন।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

মীমাংসা দর্শন।

মহর্ষি জৈমিনি কর্ম্মকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া স্বীকার করেন। অপরাপর দার্শনিকের মতে কর্ম্ম কর্ত্তার অধীন; কিন্তু জৈমিনি তাহা স্বীকার করেন না। কারণ ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না; অতএব কর্ত্তৃত্বের ও কারণ আছে। যাহা একের কর্ত্তা তাহা আবার আর একটির কর্ম্ম। এইরূপে ধারাবাহিকরূপে একটি কর্ম্মস্রোত চলিতেছে। জৈমিনির মতে কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মস্রোতের একটি অংশ বা অবস্থা বিশেষ।

কর্ম্ম হইতেই সকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়; কিন্তু সংসারের বিনাশ নাই, ইহা এই ভাবেই চলিয়া আসিতেছে এবং এই ভাবেই চলিয়া যাইবে। প্রতিক্ষণেই নদীর জলের পরিবর্ত্তন হইতেছে কিন্তু নদী যেমন চির দিনই বহিতেছে, সেইরূপ প্রতিক্ষণে এক কর্ম্মের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ও অপর কর্ম্মের উৎপত্তি হইতেছে; এই কর্ম্মধারার বিরাম নাই বা শেষ নাই। কর্ম্ম হইতেই সুখ, দুঃখ, ভয়, উন্নতি, অবনতি, বদ্ধতা,

মুক্তি, গুরুত্ব, ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে; বস্তুতঃ এ সমস্তই কর্ম্মের রূপান্তর মাত্র।

মহর্ষি জৈমিনি শব্দ প্রমাণ বা বেদকেই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণকে তন্নিম্ন স্থান দান করেন, এবং অনুমান ও উপমানকে প্রত্যক্ষের অধীন বলিয়া থাকেন। ইনি বলেন যে আমাদিগের ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান লাভ হয় না; আবার যাহা কিছু অণুমান করিব তাহা সমস্তই প্রত্যক্ষের অপেক্ষা রাখে, এবং উপমার প্রত্যক্ষ না হইলে উপমান হয় না। অতএব শব্দই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

জৈমিনির বেদের প্রাধান্য স্বীকারের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। ইনি বলেন বেদ যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে বলিতেছেন আমাদিগের তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং বেদে যে সমস্ত মন্ত্র আছে তাহা আমাদিগের সাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু মন্ত্রাদিতে বর্ণিত কোনও ঈশ্বর বা দেবতা বা পিতৃপুরুষ আমাদিগের কর্ম্মফলদাতা বলিয়া কল্পনা করা উচিত নহে, কারণ সে কল্পনা আমাদিগের মানসিক ব্যাপার মাত্র, তাহা বেদবিহিত

নহে। ইনি বলেন মন্ত্রের নিমিত্তই মন্ত্র এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মের নিমিত্তই যজ্ঞ; ঐ মন্ত্র ও যজ্ঞই কর্ম্মীকে শুভাশুভ ফল দান করিয়া থাকে। ইনি বলেন বেদ-কথিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালনই কর্ত্তব্য, তদ্বিপরীতাচরণে প্রত্যবায় হয়।

অপরাপর দার্শনিকগণ যেরূপ অপবর্গ বা মুক্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন মহর্ষি জৈমিনি সেরূপ কিছুই করেন নাই। অপরাপর দার্শনিক কর্ম্মের শেষ স্বীকার করেন কিন্তু ইনি তাহা করেন না। এই স্থলেই ইহাঁর মতের সহিত অপরাপর দর্শনের মতের পার্থক্য রহিয়াছে।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

বেদান্তদর্শন।

মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্তসূত্রের রচয়িতা। একমাত্র শ্রুতির উপরই বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি সংস্থাপিত। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান নিকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। মহর্ষি জৈমিনির কৃত দর্শনেরও মূল শ্রুতি। এই নিমিত্ত জৈমিনি-দর্শনকে পূর্ব্ব মীমাংসা কহে, এবং বেদান্ত দর্শনকে উত্তর মীমাংসা কহে। জৈমিনি সমগ্র শ্রুতি হইতে কেবল কর্ম্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বেদব্যাস তাহা হইতে কেবল মাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, সমস্ত শ্রুতি বলিতেছেন কেবল একমাত্র ব্রহ্মই আছেন তদতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই—একমেবাদ্বিতীয়ং। সাংখ্যকার পুরুষ ও প্রকৃতি রূপ দুইটি তত্ত্ব দেখিয়াছেন, পতঞ্জলিও দ্বৈতবাদী, ন্যায় বৈশেষিকও দ্বৈতবাদী, জৈমিনিও দ্বৈতবাদী কারণ তিনি কার্য্য ও কারণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বেদান্ত বলেন দুই নাই, ভেদ নাই; সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,

সমস্তই ব্রহ্ম। বেদান্তের ন্যায় আর জ্ঞান নাই, ইহাই চরম জ্ঞান।

এক্ষণে এই বেদান্ত সম্বন্ধে রামানুজ ও শঙ্করাচার্য্যের মত ভিন্নরূপে বর্ণিত হইতেছে।

রামানুজস্বামীর মত।

বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ।

রামনুজ বলেন যে ব্রহ্ম বিশেষণ যুক্ত ; কিন্তু এই বিশেষণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। গুণ কখনও গুণীকে ছাড়িয়া পৃথকভাবে থাকিতে পারে না, গুণ ও গুণীর নিত্য অভেদ। ব্রহ্মই ভোগ্য, ভোক্তা ও নিয়ামকরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ভোগ্যবস্তু জড় এবং ভোক্তা ও নিয়ামক চৈতন্য। কিন্তু জড়ের কোনও পৃথক্ সত্ত্বা নাই। জড়ত্ব ব্রহ্মের একটি বিশেষণ মাত্র - ব্রহ্ম জগৎ বিশিষ্ট।

ব্রহ্মের গুণ বা বিশেষণ নিত্য। কিন্তু এই গুণের কখনও বা স্থূল প্রকাশ হয়, আবার কখনও বা গুণ সূক্ষ্ম সত্ত্বারূপে অবস্থিত থাকে। যখন এই গুণের স্থূল প্রকাশ হয় তখনই সৃষ্টি ও স্থিতি আবার যখন গুণ স্থূলভাব পরিহার পূর্ব্বক সূক্ষ্ম সত্ত্বারূপে পরিণত হয় তখনই জগতের লয়। একটি উপমা যেমন কূর্ম্ম ইচ্ছা করিলে তাহার

সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশিত করিতে পারে, আবার সঙ্কুচিত করিয়া দর্শকের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত ও করিতে পারে। গুণই ক্রিয়ার উৎপত্তি করে, গুণই তাহার স্থিতি ও পরিবর্ত্তন করে, এবং গুণই ক্রিয়াকে কারণে লয় করে। অতএব গুণ নিত্য।

ইনি বলেন ব্রহ্মেতে বিশেষণ থাকিলে ব্রহ্ম দূষিত হয়েন না। যদিও বিশেষণের স্থূলপ্রকাশ ও সূক্ষ্ম সত্বা এই দুই অবস্থা-ভেদ হয়, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মের ভেদ হয়না। বস্তুর প্রকাশ-ভেদ হইলেই যে বস্তুর ভেদ হয় এরূপ বলা যায় না। আমি কার্য্য করি বা নিদ্রা যাই তাহাতে আমার কিছু মাত্র ভেদ হইল না, আমি যাহা তাহাই রহি। ব্রহ্ম যখন ইচ্ছা দ্বারা নিজেতেই জগৎ উৎপাদন করেন অথবা যখন ইচ্ছা দ্বারা নিজেতেই সেই জগতের লয় করেন ইহার কোন স্থলেই ব্রহ্মের ভেদ হইল না ; ব্রহ্ম যাহা ছিলেন তাহাই রহি-লেন। অনন্ত শক্তিধর যিনি, তিনি সেই শক্তি প্রকাশই করুন আর নাই করুন, তিনি বা শক্তি-ইহার কখনও অভাব বা পার্থক্য ঘটিবে না।

শ্রুতিতে নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, প্রভৃতি যে সমস্ত বাক্য আছে, রামানুজ তাহার অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করেন। নির্গুণ শব্দে গুণ নাই বা নির্ব্বিশেষ শব্দে তাঁহার বিশেষণ নাই এরূপ অর্থ করেন না। তিনি বলেন নির্গতো বিশেষঃ যস্মাৎ তৎ ইতি নির্গুণং, অর্থাৎ যাঁহা হইতে বিশেষণ নির্গত হইয়াছে ইত্যাদি। এরূপ অর্থ ব্যাকরণ বিরুদ্ধ নহে; বস্তুতঃ শ্রুতি কি ভাবে এই সকল বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহা ঠিক করিয়া কেহই বলিতে পারেন না। যাঁহার যেরূপ বোধ হয় তিনি সেইরূপই ব্যাখ্যা করেন।

রামানুজ বলেন যে ব্রহ্মের বিশেষণ স্বীকার না করিলে সমস্ত জগৎ মিথ্যা হইয়া যায়, বেদ মিথ্যা হইয়া যায়, সমস্ত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম মিথ্যা হইয়া যায়, মতামত সমস্তই ভাসিয়া যায়, অর্থাৎ এ সমস্ত কিছুই নাই এইরূপ হয়। যে ব্যক্তি ঘোরতর কুক্রিয়াসক্ত তাহার সহিত মহাজ্ঞানীরও কোন প্রভেদ থাকে না, কারণ উভয়ই মিথ্যা। ইহা অতি ভয়ানক ব্যাপার।

দ্বিতীয়তঃ সমস্ত শাস্ত্রই বলেন এবং বেদান্তও

বলেন যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারই মুক্তি। কিন্তু যদি বিশেষণ না থাকে তবে কিসেরই বা ব্রহ্ম আর কিসেরই বা সাক্ষাৎকার হইবে ?

তৃতীয়তঃ ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হইলে তাঁহাতে কোন প্রকার প্রমাণই ব্যবহৃত হইবে না; এবং তাহা হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব থাকাও যাহা না থাকাও তাহা হইয়া উঠে।

রামানুজ বলেন যে জীব যখন সাধন দ্বারা অনন্যাভক্তি লাভ করেন তখন তাঁহার মুক্তি লাভের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং ঐ ভক্তিই তাঁহাকে মুক্তিদান করে।

শঙ্করাচার্য্যের মত।

বিশুদ্ধাদ্বৈত বাদ।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলেন ব্রহ্মই সমস্ত; তাঁহার কোনও গুণ বা বিশেষণ নাই। উপনিষদে যে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ প্রভৃতি বাক্য আছে ইনি সে সকলের এইরূপ অর্থ করেন যে নির্ নাস্তি গুণং যস্ত তৎ নির্গুণং ইত্যাদি অর্থাৎ যাঁহার কোন গুণ নাই, রূপ নাই, বিশেষণ নাই ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে শ্রুতিতে অনেক স্থলে ব্রহ্মকে সগুণ, ক্রিয়াবান, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা বলা হইয়াছে। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য এই দুই ভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিয়া বলেন যে শ্রুতিতে যে যে স্থলে ব্রহ্মকে নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নির্ব্বিকার ইত্যাদি ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহাই যথার্থ-তত্ত্ব, তাহাই পারমার্থিক সত্য; এবং যে যে স্থানে তাহাকে সগুণ, ক্রিয়াবান

ইত্যাদি বলা হইয়াছে তাহা যথার্থতত্ত্ব নহে, সেগুলি ব্যবহারিকভাবে বলা হইয়াছে। তিনি বলেন যে শ্রুতির পারমার্থিক অংশ নির্গুণ বিদ্যা এবং ব্যবহারিক অংশ সগুণ বিদ্যা। জ্ঞানীদিগের পক্ষে নির্গুণ বিদ্যা এবং অজ্ঞানী দিগেব পক্ষে সগুণ বিদ্যা; অর্থাৎ যতক্ষণ অজ্ঞান থাকে ততক্ষণই সগুণ বিদ্যা থাকে যখনই অজ্ঞানের নাশ হয় তখনই নির্গুণ বিদ্যা। অজ্ঞানী নির্গুণ বিদ্যার অধিকারী নহে; তাঁহাকে সগুণ বিদ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞানমার্গে আরোহন করিতে হইবে; এবং যখন তিনি জ্ঞানলাভ করিবেন তখন সূর্য্য উদয়ে অন্ধকারের ন্যায় নির্গুণ বিদ্যা তাঁহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইবে। জ্ঞান শব্দে ব্যবহারিক জ্ঞান বুঝায় না। ব্রহ্ম ব্যবহারিক জ্ঞানগম্য নহেন কারণ তিনি "অবাঙ্ মনসো গোচরং" বাক্য ও মন দ্বারা তাঁহার উপলব্ধি হয় না। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ," "বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্", "অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাম্" ইত্যাদি দ্বারা তিনি মন ও বুদ্ধির অতীত ইহা

বলা হইতেছে; "নেতি নেতি" বলিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিশেষণের অবর্ণনীয় বলা হইতেছে। অতএব আমরা যখন বাহ্য বা অন্তর্জগতের অস্তিত্ব-জ্ঞানশূন্য হইব তখনই ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি হইবে,—তিনি স্বপ্রকাশ।

এস্থলে ভগবান বাহ্ব ও রাজা বাস্কলির উপাখ্যান বর্ণিত হইতেছে। একদিন রাজা বাস্কলি ভগবান বাহ্বকে বারম্বার ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন; কিন্তু বাহ্ব কিছুমাত্রও উত্তর করিলেন না। কিন্তু পুনঃ পুনঃ রাজা প্রশ্ন করার পর বাহ্ব বলিলেন "আমি উত্তর দিয়াছি, তুমি বুঝিতে পার নাই; শান্তোঽয়মাত্মা"। বস্তুতঃ বাক্য দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা বাতুলের প্রয়াস মাত্র। এবং পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা করা মরীচিকাতে জলের প্রত্যাশা করার ন্যায় বিড়ম্বনা মাত্র। তবে সগুণ বিদ্যা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন নহে, ইহা দ্বারা সাধকের চিত্তশুদ্ধি হয়।

সৃষ্টিতত্ত্ব—এক্ষণে শঙ্করাচার্য্য সৃষ্টি সম্বন্ধে কি বলেন তাহা বর্ণিত হইতেছে। শ্রুতিতে কোন

স্থানে আছে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব"। অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্ট হইতেছে. ব্রহ্ম দ্বারাই জগতের স্থিতি হইতেছে, ব্রহ্মতেই সমস্ত লয় হইতেছে ইত্যাদি। আবার কোথায়ও আছে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "একমেবা-দ্বিতীয়ং" ইত্যাদি ; অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্মাতি-রিক্ত কিছুই নাই। এস্থলেও ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভেদ রহিয়াছে। যতদিন আমাদের অজ্ঞান থাকিবে ততদিন জগৎ থাকিবে এবং যখন অজ্ঞান দূরীভূত হইবে তখন জগতের সত্ত্বাও থাকিবেনা। যখন অজ্ঞানের অভাবে জগতের অভাব হয় তখন অজ্ঞান বা অবিদ্যাই জগতের কারণ। অবিদ্যা যে কখন আসিল তাহার সীমা নাই ; অতএব অবিদ্যা অনাদি। আবার জ্ঞানের উদয় হইলে অবিদ্যার নাশ হয়, অতএব অবিদ্যা সান্ত। অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপ নামে দুইটি শক্তি আছে। আবরণ শক্তি সত্যকে আচ্ছন্ন করে এবং বিক্ষেপ শক্তি তাহাকে অন্য ভাবে প্রকাশ করে। রজ্জুতে যে সর্পভ্রম

হয় তাহা এইরূপ ;—অজ্ঞান প্রথমে আবরণ শক্তি দ্বারা আমাদের রজ্জুর বোধকে আচ্ছন্ন করে এবং পরে বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা তাহাকে সর্পরূপে প্রকাশ করে। সেইরূপ অজ্ঞান প্রথমে ব্রহ্মকে বা আত্মাকে আবরণ করে ও পরে তাঁহাতেই প্রপঞ্চ জগতের বোধ করায়। এই অনাত্মাকে আত্মজ্ঞান অযথার্থকে যথার্থজ্ঞান, ব্রহ্মতে জগৎ জ্ঞান, আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ইত্যাদি জ্ঞানের নাম অধ্যাস। সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, কর্ম্মফল, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই অধ্যাস বশতঃ ঘটিয়া থাকে। বস্তুতঃ আত্মজ্ঞান হইলে এ সমস্ত কিছুই থাকে না। ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, শাস্ত্র, অশাস্ত্র, পাপ, পুণ্য, ভাল, মন্দ সমস্তরই অবসান হয়, কারণ সকলই অধ্যাসমূলক।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে সত্যেতে মিথ্যার ন্যায় আলোকেতে অন্ধকারের ন্যায় আত্মাতে কিরূপে অবিদ্যার সম্ভব হয়। তদুত্তরে শঙ্কর একটিমাত্র উপমা দিয়াছেন। দিবাভাগে প্রচণ্ড সূর্য্যালোক থাকে, তখন আলোকের কিছুমাত্র অভাব থাকে না, পরন্তু পেচক তখন দেখিতে

পায় না। অতএব যেরূপ আলোকেতেও অন্ধকারের কার্য্য করে, সেইরূপ আত্মাতেও অবিদ্যার কার্য্য হয়। আবার প্রশ্ন হইতে পারে যে যখন অবিদ্যাই আমাদের মোহ ও সমস্ত অনর্থের কারণ তখন আত্মা কি জন্য অবিদ্যাকে আশ্রয় করেন? তাহার উত্তরও শঙ্কর কেবলমাত্র একটি উপমাদ্বারা দিয়াছেন; বালকগণ অনেক সময় তাহাদের নিজের হানিকর ব্যাপারে আসক্ত হয়, তাহারা এমন কি তাহাদিগের গুরুজন দিগের আদেশ ও উপদেশ পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করে; আবার অনেকে স্বাস্থ্যহানি হইবার আশঙ্কা থাকিলেও নিমন্ত্রনে যাইয়া ভূরিপরিমাণ ভোজন করেন, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি করিয়া থাকেন; অতএব আমরা যে জানিয়া শুনিয়া নিজের অনিষ্টকর বিষয়ে আসক্ত হই ইহা সপ্রমাণ হইল। আবার প্রশ্ন হইতে পারে যখন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" তখন অবিদ্যা কাহার এবং কিরূপেই বা সম্ভবে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর একটি মাত্র উত্তর দিতেছেন; তিনি বলেন এ সমস্ত আবার প্রশ্ন কি? ইহার আবার বিচার কি?

যে বিষয় সহজে অনুভব হয় না তাহারই জন্য ত বিচার আবশ্যক; কিন্তু যখন কোন বিষয় সততই এবং স্বভাবতঃই বোধগম্য হয়, তখন আবার তাহার সম্বন্ধে বিচারের কি আবশ্যক! নিজের অনুভবকেই যদি বিশ্বাস না কর তবে আবার তর্ক কিসের জন্য? তর্কতো নিজের অনুভব সিদ্ধির জন্যই করা হয়? তবে অনুভবই প্রধান। তুমি নিজেই অনুভব করিতেছ যে তুমি অজ্ঞান, তুমি মোহাচ্ছন্ন; তবে অজ্ঞান কাহার, অজ্ঞান কিরূপে সম্ভব, কেন অজ্ঞানকে আশ্রয় করিলাম, ইত্যাদি প্রশ্ন কিজন্য করিতেছ? এরূপ অবস্থায় এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। যদি বল সমস্ত সময়ে নিজে যাহা অনুভব করি তাহা ঠিক হয় না, অতএব তাহা সত্য কি অসত্য প্রমাণের জন্য তর্ক আবশ্যক; তাহার উত্তরে আমি বলি যে তোমার অনুভব যে ঠিক তাহা তুমি ঠিক বুঝিতেছ, ইহা তোমার বুদ্ধিতে পৌঁছিয়াছে, অতএব এ সম্বন্ধে তর্কের আবার কি প্রয়োজন? যখন অজ্ঞান আছে ইহা নিশ্চয় বুঝিলে তখন তাহার কারণ কি তাহা স্থির হউক

বা না হউক তাহাতে কিছুই আসে যায় না। চোর যখন চুরী করিয়া পলায়ন করে তখন সে চোর কি না, তাহার উদ্দেশ্য কি, সে কেন চুরী করে ইত্যাদি বিচারের কিছুই আবশ্যকতা নাই। চুরী যে হইল তাহা ঠিক, অতএব যাহাতে চুরী না হয় বা যাহাতে চোর চুরী করিয়া পলাইতে না পারে সেইরূপই ব্যবস্থা করা উচিত। অজ্ঞান কি? অজ্ঞান কেন? অজ্ঞানের কি প্রকারে সম্ভব? এ সমস্ত প্রশ্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহাতে অজ্ঞানের নাশ হয় তৎপ্রতিকার করাই সমীচিন। আর এ সম্বন্ধে অধিক কি বলিব যখন চৈতন্যে অজ্ঞানের অনুভব হইতেছে তখন বুঝিতে হইবে চৈতন্য ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী নহে, কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইবে, তখন সেই জ্ঞান অজ্ঞানকে দূর করিবে। সেই তত্ত্বজ্ঞানই কেবল অজ্ঞানের বিরোধী।

অবিদ্যা বা মায়া যে আছে তাহা আমরা যখন অজ্ঞান অবস্থায় থাকি তখনই বোধ করি; তখন ইহার আদি কোথায় তাহার বোধ হওয়াও অসম্ভব; অতএব অবিদ্যা বা মায়া আমাদিগের

নিকট অনাদি বলিয়াই বিবেচিত হয়। কিন্তু জ্ঞান যেথানে আছে মায়া সেখানে নাই অতএব তত্ত্বদৃষ্টিতে মায়ার অস্তিত্ব নাই। যুক্তি দৃষ্টিতে বা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অবিদ্যা সদসৎ অনির্বাচ্য, কিন্তু পরমার্থ দৃষ্টিতে মায়া মিথ্যা। যতক্ষণ মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বোধ থাকিবে ততক্ষণই বন্ধন, আর যে মাত্র তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা মিথ্যাকে মিথ্যা বুঝিব তখনই মোক্ষ।

বেদান্ত দর্শন।

সাধন তত্ত্ব।

বেদান্ত শাস্ত্র বলেন যে সাধক যে কোন মার্গই অবলম্বন করুন না কেন সকলেরই ফল চিত্তশুদ্ধি। সমস্ত শাস্ত্রই বলেন যে কর্ম্মফলই জন্ম মৃত্যুর কারণ এবং তাহারই নাম বন্ধন। জন্ম মৃত্যুর অতীত হইতে হইলে কর্ম্মের শেষ হওয়া আবশ্যক। কৃত কর্ম্মের ফল অবশ্যই আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে; অতএব তজ্জন্য নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান আবশ্যক। কিন্তু পুনর্ব্বার যাহাতে কর্ম্মফল উৎপন্ন না হয় এইজন্য সমস্ত কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং সমস্ত প্রকার নিষিদ্ধ কর্ম্মও ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ যে সমস্ত কর্ম্মে শুভ বা অশুভ ফল হয় সে সমস্তই জন্মের কারণ। পরন্তু নিত্য. নৈমিত্তিক, ও প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্ম্ম দ্বারা পূর্ব্ব সঞ্চিত ফলের নাশ হয়—তাহাতে

নূতন ফল সঞ্চিত হয় না। অপরদিকে মনেতে যে কর্ম্মের বীজ থাকে তাহার ধ্বংসের জন্য উপাসনা করা আবশ্যক। শ্রবণ, মনন, নিদি-ধ্যাসনের দ্বারা চিত্ত স্থিরতা লাভ করে। চিত্ত স্থির না হইলে তাহাতে সত্য বস্তু প্রতিফলিত হয় না এবং চিত্ত স্থির না হইলে তাহাতে কর্ম্মের মূল বাসনা থাকিয়া যায়। অতএব উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপে সাধন করিলে সাধক চারিটি অমূল্য রত্ন লাভ করিবেন যথা—আত্মানাত্ম বস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ষট্ সম্পত্তি, এবং মুমুক্ষুত্ব।

যখন কি সত্য এবং কি মিথ্যা, অর্থাৎ যখন আত্মার স্বরূপ বোধ হয় তখনই আত্মানাত্ম বস্তু-বিবেক সিদ্ধ হয়। যখন সাধক ইহকালের সর্ব্ব-প্রকার সুখ লাভের ইচ্ছা ত্যাগ করেন এবং যখন পরকালের স্বর্গ ইত্যাদি ভোগের বাসনা ত্যাগ করেন তখন তাঁহার ইহামুত্রফলভোগবিরাগ সিদ্ধ হয়। শম শব্দে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও তদনুকূল সমস্ত বিষয় ভিন্ন অপরাপর সমস্ত

বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি বুঝায় ; অর্থাৎ সাধক যখন উপাসনা এবং তাহার জন্য যে সমস্ত বহিরঙ্গ সাধন আবশ্যক তদতিরিক্ত অপর কোন বিষয়কে মনেতে স্থান দেন না তখনই তাঁহার শম সিদ্ধ হয়। সাধনের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয় হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে সাধক যখন নিবৃত্ত করেন তখন তাঁহার দম সিদ্ধ হইল। সাধক যখন সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত শাস্ত্রোক্ত কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন তখনই তাঁহার উপরতি সিদ্ধ হইল। সন্ন্যাস কাহাকে বলে তাহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে ভালরূপে বুঝাইয়াছেন। তিনি বেশ ভাল করিয়া বলিয়াছেন যে অন্তরে সন্ন্যাস ভাব না আসিলে কেবল বাহিরে সন্ন্যাসী হইলে বিড়ম্বনা মাত্র—তাহা মিথ্যাচারমাত্র। অতএব সমস্ত প্রকার শাস্ত্রীয় কর্ম্মত্যাগের পূর্ব্বে সাধক যেন ভাল করিয়া দেখেন যে তাঁহার মনে কোন প্রকার বাসনা আছে কিনা? কারণ মনে মনে বাসনা করিলেই যথার্থরূপে কর্ম্ম বন্ধন হয় ; মনই সমস্ত কর্ম্ম করে শরীর একটা উপাদান কারণ-মাত্র। যথার্থ সন্ন্যাস যখন মনেতে উপস্থিত হয়

তখনই উপরতি সিদ্ধ হয়। যখন শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, নিন্দা, স্তুতি, ভাল, মন্দ, মান, অপমান প্রভৃতি কিছুতেই সাধকের চিত্ত বিক্ষেপ উপস্থিত করিবে না তখনই তাঁহার তিতিক্ষা সিদ্ধ হইবে ; তিতিক্ষা শব্দের অর্থ দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও তদনুকূল বিষয়ে মনের একাগ্রতার নাম সমাধান। গুরুবাক্য ও শাস্ত্র (বেদান্ত) বাক্যে বিশ্বাস করার নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা না থাকিলে কিছুই হয় না। শ্রদ্ধা প্রথম হইতেই আবশ্যক, ইহাই মুক্তির মূল। সাধক যখন শম দমাদি সিদ্ধ হইবেন তখন তাঁহার ষট্‌ সম্পত্তি লাভ হইবে। মুমুক্ষুত্ব শব্দে মোক্ষের ইচ্ছা বুঝায়। অল্পের মধ্যে বেদান্তোক্ত সাধন বিষয়ে কিছু কিছু বলা হইল। মোক্ষ-কাম ব্যক্তি গুরু ও শাস্ত্র আশ্রয় করিলেই সমস্ত রহস্য বুঝিতে পারিবেন। ওঁ তৎসৎ ওঁ

উপসংহার।

কি শিখিলাম !

ছয়টি দর্শন যাহা বলেন তাহার স্থূল মম্মত আলোচনা করা গেল। কিন্তু হঠাৎ প্রথমটা যেন একটু ধাঁধা লাগে। প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের মতভেদ। যখন এত বড় বড় ঋষিদের মধ্যে এই প্রকার ভেদ তখন ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমাদের কি উপায় হইবে; আমরা কাহার পথ অনুসরণ করিলে মুক্তি পাইব; এই প্রকার চিন্তা আমাদিগের চিত্তকে আন্দোলিত করিতে থাকে। কিন্তু বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে করিতে পরে এ সমস্ত বিষয় ক্রমে ক্রমে আমাদের বোধ গম্য হয়।

প্রথমেই আমাদের ইহা ধরিয়া লইতে হইবে যে মানুষ যত বড়ই হউন না কেন তাঁহার বুদ্ধি ও ভাষা কখনও অতীন্দ্রিয় বিষয়কে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে পারিবে না; এমন কি যিনি সকল তত্ত্বের মূল পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছেন, তিনিও তদ্বিষয়ে বিশেষ কিছু প্রকাশ করিতে পারেন না।

অতএব ধার্য্য হইল যে আমাদের বিচার যতই কেন সূক্ষ্ম হউক না, সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল মন দ্বারা সম্পাদিত হয়, এবং তজ্জন্যই অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব বিষয়ে এত প্রকার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

তবে এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের মধ্যেও অনেক বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়; সেই গুলিকে অখণ্ডনীয় প্রাকৃতিক বিধান বলা হয়। এতদ্বিষয়ে আলোচনা করা অনেক পরিমাণে সহজ, কারণ এ সমস্ত ব্যাপার লইয়া পরীক্ষা চলে; এবং যে মত যত অধিক প্রামাণ্য তাহা তত অধিক রূপে গ্রাহ্য করা হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে পরীক্ষা চলে না তদ্বিষয় সম্বন্ধে মতামত যে কোন্‌টি ভাল তাহা বিচার করা যেরূপ অসম্ভব, আবার সেই বিষয় সম্বন্ধে মতামতের সংখ্যাও সেইরূপ বহু হইয়া উঠে।

এই নিমিত্তই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে সমস্ত দর্শনকারগণ একটা বিশেষ স্থানে যাইয়াই যত গোলে পড়িয়াছেন। সাংখ্যকার প্রকৃতি ও পুরুষ তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন এবং তাহাদের সংযোগে জগৎ সৃষ্টি ইহা সাব্যস্থ করিলেন; কিন্তু মধ্য হইতে একটা অদৃষ্ট নামক তত্ত্ব আনিয়া

বলিলেন যে ইহাই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ ঘটায়। পতঞ্জলি কপিলের সমস্ত কথা স্বীকার করিলেন, কিন্তু অদৃষ্ট যে সৃষ্টির মূল কারণ তাহা স্বীকার না করিয়া জড় অদৃষ্টের পরিচালক ঈশ্বর তত্ত্ব কল্পনা করিলেন। গোতম অতি সতর্কতার সহিত এক অভিনব পন্থায় বিচার করিয়া সকল তত্ত্বের মূল ঈশ্বর তত্ত্ব স্বীকার করিলেন। কিন্তু ইহাঁর ঈশ্বর ও পতঞ্জলির ঈশ্বরে এক মহা প্রভেদ আছে; পতঞ্জলির ঈশ্বর অদৃষ্টের পরিচালক পুরুষবিশেষ মাত্র, কিন্তু গোতমের ঈশ্বর পরিদৃশ্য-মান জগতের কর্ত্তা। গোতমের সহিত কণাদের বিশেষ অনৈক্য নাই, তবে সৃষ্টির উপাদান কারণ সম্বন্ধে ইনি আর একটু সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। জৈমিনি অতীন্দ্রিয় বিষয়টা বিচারের মধ্যে আনিতে একেবারে অনিচ্ছুক; সেই জন্য তিনি একটা সোজা কর্ম্মরূপ ধারা দেখাইয়াছেন, যেটা তাঁহার মতে অনাদি, অনন্ত, শত সহস্র পরি-বর্ত্তনের মধ্যেও সদা একভাবে প্রবাহিত। ইনি জীব জগতের আদি ও পরিণাম কিছুই কল্পনা করিতে প্রস্তুত নহেন। বেদব্যাস জীব জগতের

আদি, মধ্য ও অন্ত সমস্তের মধ্যেই এক অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব দেদীপ্যমান রহিয়াছে দেখিলেন। কিন্তু যাঁহারা বেদান্তবাদ স্বীকার করিলেন তাঁহাদের মধ্যে বেদব্যাসের অর্থ লইয়া নানারূপ মতভেদ হইল। অপর কোনও দর্শন সম্বন্ধে এত মতভেদ নাই। বেদান্ত সম্বন্ধীয় সমস্ত মতের মধ্যে রামানুজ ও শঙ্করের মতই সর্ব্ব প্রধান। উভয়েই অদ্বৈত ব্রহ্ম স্বীকার করিলেন, কিন্তু সৃষ্টি তত্ত্ব লইয়া তাঁহাদের মতভেদ হইল। রামানুজ বলিলেন সৃষ্টি ব্রহ্মেচ্ছা, আর শঙ্কর বলিলেন সৃষ্টিটা একটা মায়া—ভেল্কি।

এখন বুঝিলাম যে অতীন্দ্রিয় বিষয়ক বোধটা আমাদের চিরপরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক মন বুদ্ধি সংযুক্ত দেহের ক্ষমতাতীত। আর এই মায়িক অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত যে এক সনাতন সত্ত্বা আছে পারমার্থিক তত্ত্ব কেবল তাহারই বিষয় এবং তাহাই। এই টুকু মাত্র আমাদের বিচার লব্ধ ফল, এই স্থানেই ছয়টি দর্শনের আলোকরশ্মি একত্র কেন্দ্রীভূত।

এই স্থানে আসিলে আমাদের মধ্যে আবার

একটা বিষম মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। এই মত ভেদের জন্য আমরা পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর লোক দেখি। এক প্রকার লোক প্রত্যক্ষবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক নানাবিধ জাগতিক কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তদাচরণে তৎপর; তাঁহারা মনুষ্যের ঐহিক উন্নতির জন্য কত কত বিষয় উদ্ভাবন করিতেছেন এবং নানারূপ কর্ম্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। অপর একপ্রকার লোক জীব জগতকে মায়িক বলিয়া তৎসম্বন্ধীয় সমস্তরূপ কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া সনাতন সৎস্বরূপে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিতেছেন। আবার এই দুই ভাবের সংমিশ্রণে নানাবিধ ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে। সাংসারিক লোকে প্রত্যক্ষ জগতের সমস্ত কর্ম্মই করে এবং অপরোক্ষ আত্মার পরকালের উপায়ও চিন্তা করে, অপর পক্ষে বিরক্ত নির্ব্বাণপ্রয়াসী ও দেহযাত্রার জন্য নানারূপ জাগতিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। এই প্রকার মিশ্রভাব যে কতরূপ হয় তাহার সীমা নাই; যতগুলি লোক ততরূপ প্রকারের ভাব হওয়াও অসম্ভব নহে।

একটা বিষয়ে আর মতভেদ নাই—সেটা মৃত্যু।

আমাদের দেহ ছিলও না. আর থাকিবেও না। দেহের কথন যে কি হইবে তাহাও আমরা জানি না; অতএব ইহাও সাব্যস্থ হইল যে প্রত্যক্ষ বিষয় সম্বন্ধেও মনুষ্যের জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ। এরূপ অবস্থায় প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ কোনটাকেই নিন্দা করা সুযুক্তি নহে।

অতএব আমাদের এরূপ ভাবে চলিতে হইবে, যাহাতে দুই কুল রক্ষা হয়। অবশ্য এ বিষয়ে নানা তর্ক উঠিতে পারে। কিন্তু কাহাকে ছাড়িব? যদি বুঝি একেবারে নির্ব্বাণ হইল আর দেহযাত্রার আবশ্যক নাই, তাহা হইলে আর কর্ম্মের আবশ্যকতা রহিল না। কিন্তু তাহাত একেবারে হয় না। অতএব যাবৎ নির্ব্বাণ আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে হইবে এবং যোগও করিতে হইবে। তবে এই দুইটার জন্য যদি দুইটা পৃথক সময় স্থির করি তবে একটু অসুবিধা হইয়া উঠে, কারণ যোগবিহীন কর্ম্মের সংস্কারটা যোগাভ্যাসের সময় বড়ই উৎপাত করে এবং সমাধিটাকে এক প্রকার অসম্ভব করিয়া তুলে। অতএব আমাদিগকে যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে

হইবে। যেমন আমরা সর্ব্বাবস্থাতেই "আমি অমুক মানুষ" এই বোধের মধ্যে থাকি, সেইরূপ যেন "অহং ব্রহ্মাস্মি" ভাবটাও সর্ব্বাবস্থাতে আমাদের মধ্যে দেদীপ্যমান থাকে। "আমি অমুক মানুষ" এই বোধটা যেরূপ স্বাভাবিক, "অহং ব্রহ্মাস্মি" ভাবটাকেও সেই প্রকার স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে হইবে। অভ্যাসই ইহার সাধন।

কি কর্ম্ম করা উচিত তৎসম্বন্ধে একটা সাধারণ ভাবে বিচার করা যাইতে পারে। অবশ্য সমস্ত কাম্য কর্ম্ম আমাদিগকে প্রথম হইতেই বিসর্জ্জন করিতে হইবে, কারণ যে যে কর্ম্মেতে এই ক্ষণ বিধ্বংসী দেহের ও তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ের সুখ সাধন হয় তাহা আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী। বরং দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা অভ্যাস দ্বারা আমাদের দেহাভিমানটা দূর করিতে চেষ্টা করাই উচিত সাধারণ হিতকর অথচ দেহের অহিতকর কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়া এবং অনর্থক বাহাদুরী দেখাইবার জন্য দেহের পীড়াদায়ক কার্য্য করা উভয়ই তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী। প্রেম না থাকিলে কর্ম্ম করা চলে না;

অতএব এই সহস্রশীর্ষা বিরাট পুরুষ জীব জগৎকে প্রেম করিতে হইবে এবং তাঁহার সেবায় নিজের দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গীকৃত করিতে হইবে। ব্যবহারিক ও পারমার্থিকে গোল বাধাইও না। জগৎটাকে মায়া বলিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিও না। মায়াতে মায়াতেত মিল আছে; অতএব এই যে মায়িক জগৎ, তাহার সেবাতে তোমার মায়িক দেহ, মন, প্রাণকে লাগাইয়া দাও। তাহাতেত পরমার্থতত্ত্ব মিথ্যা হইবে না, পরন্তু এই নশ্বর দেহটা এই অনাদি বিরাটের সেবায় নিয়োজিত হইয়া ধন্য হইবে। ভেদ করিও না, জগতেও ব্রহ্মে ভেদ নাই—"একমেবা দ্বিতীয়ং"। এই সমস্ত কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে ব্যক্ত করিয়াছেন; এই সমস্ত কথা বুঝাইবার জন্যই ভগবান শঙ্করের জন্ম। তিনি বৌদ্ধগণকে বুঝাইলেন যে পারমার্থিক তত্ত্ব এক, এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে কোনই মতভেদ নাই; কিন্তু ব্যবহারিক জগৎটা উপেক্ষার জিনিষ নহে, তাহা একটা মহা ব্যাপার; সেখানে কোন-রূপ ফাঁকি চলে না। তাই তিনি কত স্তব স্তুতি

রচনা করিলেন, কত ভাষ্য রচনা করিলেন, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিজয় নিশান তুলিয়া সমগ্র ভারতকে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করাইলেন।

কোন্ কর্ম্ম ভাল কোন্ কর্ম্ম মন্দ তৎসম্বন্ধে নিজের মনই সাক্ষ্য দিবে। ত্যাগের পথে চলিতে হইবে। ধন, মান, যশ, সুখ, দুঃখ, প্রাণ, ইহকাল পরকাল সমস্তই বিসর্জ্জন পূর্ব্বক লোকহিতকর কার্য্য করাই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যেখানেই নিজের লাভের দিকে একটু টানে তাহাই পরিত্যজ্য; যেখানেই অপরের মঙ্গলের দিকে একটু টানে তাহাই কর্ত্তব্য। ভাবের ঘরে যেন কখনও চুরী করি না; প্রত্যেক কাজটা করিবার পূর্ব্বে এবং কোন কার্য্য হইতে বিরত হইবার পূর্ব্বে যেন হৃদয়টা ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখি যে এটা নিজের সুখের জন্য করিতেছি, না বিরাট পুরুষের সেবার জন্য। কোন কর্ম্ম করিলে যেন মনে অহঙ্কার আসে না, পরন্তু যেন বিরাট পুরুষের সেবাব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক নিজের জীবনকে ধন্য মনে

করি। আর যখনই দুঃখ দারিদ্র্য আমাদিগকে অভিভূত করিতে আসিতেছে দেখিব, যখনই দেখিব মৃত্যু তাহার ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে তখনই যেন স্মরণ করি "অহং ব্রহ্মাস্মি"।

ওঁ তৎসৎ ওঁ

Cover Printed at the
BEE PRESS.